দৈনিক বাংলা 24

তারিখ 27 AUG 1990
পৃষ্ঠা 1 কলাম 9

পরীক্ষা, পরীক্ষক এবং আমাদের দায়-দায়িত্ব

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তর বলাবলি হয়েছে এবং হচ্ছে। শিক্ষার্থীর মেধাও মান নির্ণয়ে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি তেমন নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। তাই এই পদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে প্রায় সকলেই প্রকৃতপক্ষে একটু একটু করে এতে পরিবর্তন আনা হচ্ছেও।

কিন্তু একটি দিক আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তা হল পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা। বর্তমান ব্যবস্থায় চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলোর (এইচএসসি স্তর পর্যন্ত) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব শিক্ষাবোর্ডগুলো পালন করেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনে বোর্ড তার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও তার শিক্ষকবৃন্দের সাহায্য গ্রহণ করেন। কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে। পরীক্ষক, নিরীক্ষক, টেবুলেটর হিসাবে শিক্ষকদেরকে।

'পরীক্ষা কেন্দ্র' হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র যথাযোগ্য সতর্কতার সঙ্গে বোর্ডে পাঠানো হয়। তারপর তা রীতিমাফিক পরীক্ষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। পরীক্ষকগণ মূল্যায়ন করে প্রধান পরীক্ষকের কাছে এবং প্রধানপরীক্ষক পর্যবেক্ষণ শেষে শিক্ষাবোর্ডে নম্বরপত্র জমা দেন। উক্ত নম্বরপত্র দিয়ে টেবুলেটরগণ বোর্ডে বসে (বা অন্য কোথাও) কাজ করে কাগজপত্র সকলি বোর্ডে ফেরত দেন।

অর্থাৎ একটি সুশৃঙ্খল সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইসব পরীক্ষা পর্ব সম্পাদিত হয় এবং ফলাফল প্রকাশিত হয়। প্রশ্নপত্রের বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সফলতা ব্যর্থতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। স্পষ্টভাবে বলা যায় -- পরীক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুষঙ্গ।

এখন দুঃখ -- এই ব্যবস্থাপনার স্তরেও নানাধরনের জটিলতা দেখা দিচ্ছে বা ধীরে ধীরে দিতে শুরু করেছে -- যার শিকার হতে হচ্ছে করুণভাবে পরীক্ষার্থীদেরকে। এবং অনেকটা তাদের অজ্ঞাতেই।

প্রথমেই দেখা যাক 'উত্তরপত্র বিপর্যয়।' অনেকসময় কোন কোন পরীক্ষকের কাছ থেকে উত্তরপত্র হারিয়ে-ই যায়। চলতি বছর একটি বোর্ডের একটি উত্তরপত্র সের দরে বিক্রি হয়ে ঠোঙ্গা হিসাবে ব্যবহারের জন্য মুদি দোকানে নীত হলে তা দৈনিক বাংলাই 'ছবি' হয়ে এসেছে। বোদ্ধা কারও হাতে না পড়লে এ তথ্য হয়ত সংবাদ হতে পারত না। কিন্তু যে ক্ষতি এতে হবে তার গুরুত্বের তাতে কিছুমাত্র কমতি ঘটত না। ফলাফল প্রকাশের আগের ব্যাপার যখন, বুঝতে হয় খাতাটি বোর্ড থেকে হারায়নি বা বে-হাত হয়নি -- কেননা বোর্ডে উত্তরপত্র জমাদানের নিয়ম ফলাফল প্রকাশের অনেক পরে। কাজেই দায়িত্ব পড়ে পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষকের ওপরে।

এমন খাতা বিপর্যয় সবসময় ঘটে না এবং চারটি বোর্ডের একটি বোর্ডেই যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তা-ও না। এর ফলে যে বিপত্তি ঘটে, কালেভদ্রে ঘটে বলেই তার পরিণাম কম করুণ হয়না।

পরীক্ষকরা যে উত্তরপত্র পান, তা বন্টনে শিক্ষাবোর্ড থাকলেও তার প্যাকেট ইত্যাদি করা হয়ে আসে কেন্দ্রসমূহ থেকে। কিন্তু ইদানীং উত্তরপত্র সুই-সুতো দিয়ে সেলাই না করে (কিংবা পাশাপাশি) স্ট্যাপল করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলে আর এক ধরনের বিপত্তি ঘটছে। তা হচ্ছে লুজশীটগুলো মূল খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। পরিষ্কার বোঝা যায় লুজসীট সংযুক্ত ছিল। কারণ অতিরিক্ত খাতার নম্বর মূল খাতায় লেখা থাকে, এছাড়াও থাকে খাতার কোণে স্ট্যাপল-এর দাগ বা চিহ্ন। কিন্তু বুঝেও পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষকের করার কিছু থাকে না -- কেননা উত্তরের পৃষ্ঠা না পেলে নম্বর আন্দাজে দেয়ার পথ নেই। এই বিপত্তির অন্য ধরনও আছে, যেমন প্যাকেটের বাঁধন এমন শক্ত হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে প্রথম একটি বা কয়েকটি খাতার টপসীট ছিঁড়ে বা ফেটে যায়--যার ফলে একটি প্রশ্নের উত্তরের একটি বিশাল অংশ আবছা হয়ে যায়। এতে করে প্রভাব পড়ে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ওপর।

এছাড়াও পরীক্ষার্থীর জন্য অদৃশ্য সংকট আরও দেখা দেয় সময় সময়। তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের নম্বর যোগ করায় বিভ্রান্তি অথবা মার্কসীটে তোলায় তাড়াহুড়োতে গরমিল। এইসব বিভ্রান্তি পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত নয়।-- এর সম্পর্ক পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতির বা ব্যবস্থার সঙ্গে।

আগেই বলা হয়েছে, এমন ভুল সব সময় সব ক্ষেত্রে হয় না ; হলেও সব সময় ধরা যায় না, তা সম্ভবই না। সবশেষে সব তথ্যই সব সময় 'সংবাদ' হিসাবে প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু তার জের বা পরিণাম একটা থাকেই যার জন্য অনেক সময় অনেক পরীক্ষার্থীকে আশ্চর্যজনকভাবে অবিশ্বাস্য দুঃখময় ফলাফল বরণ করতে হয়। কারণ অসঙ্গতি বা বিচ্যুতি কিংবা বিভ্রান্তি অথবা গরমিল ব্যাপার যাই হোক যে কোনও স্তরেই হোক -- সবশেষ পর্যায়ে তা ধরা পড়েই এবং তখন হারিয়ে যাওয়া বা বিপত্তিতে পড়া উত্তরপত্রের নম্বর প্রাপ্ত অন্য নম্বরগুলোর মান দৃষ্টে মিলিয়ে বা গড় করে দিয়ে শ্যাম-কুল রক্ষা করা হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হয়তো ঐ উত্তরপত্রের লেখাই সবচেয়ে ভাল ছিল। হয়ত সবক'টি বিষয় ভালো না হয়ে ঐটিই অতি ভাল হয়েছিল ; হয়ত ঐ পত্রের নম্বর দিয়েই পরীক্ষার্থীর ফলাফলের মানের উত্তরণ ঘটতে পারত।

এমন বিভ্রান্তি যেখানেই ঘটুক, সব সময়ই ইচ্ছাকৃত নয় অবশ্যই। তবে একে উদাসীনতা তো বলা যায়ই। একটু উদাসীনতায় যে কী বিরাট ক্ষতি হয়, তা কি আমরা ভেবে দেখি সব সময়?

আমরা সকলেই হয়ত অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত নই। কিন্তু কোনও দায়িত্বই খাটো বা কম নয়। প্রতিটি দায়িত্ব সমান গুরুত্ববহ পুরো ব্যাপারটি চেইনের মত। যে কোনও এক পর্যায়ের বিচ্যুতি পুরোটা ব্যর্থ করতে বাধ্য। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ওঠা সম্ভব সব সময় হয় না বলেই অনেক সময় অকারণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

কেবল নির্দিষ্ট কোনও কর্ণার, সেকটর, ডিপার্টমেন্ট, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নয়--এমন অবস্থা সর্বত্র। কম বা বেশী আমরা প্রায় সকলেই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যেমন তেমন করে দেখি। কখনও কখনও হয়ত বেশী সতর্ক বা সক্রিয় হই--কিন্তু তা বিশেষ সময় বিশেষ কারণবশতই। সচরাচর দায়িত্বকে গ্রহণ করি এবং পালন করি হালকাভাবে হালকা চালে।

কেবল আপন গন্ডীতে নয়— একই তথ্য অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও। যার ফলে বিভিন্ন বিভাগে —কো-অর্ডিনেশন বলতে যা বোঝায়, তা হাওয়া হয়ে গেছে। আমরা এমন যেন কেউ কাউকে চিনি না। জানি না— যার ফলে জনসাধারণের হয়রানি বাড়ছে। কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রকে এবং তার পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা অসমীচীন। চিকিৎসা, পেনশন, বেতন, প্রমোশন, থেকে আরম্ভ করে ডাক বিভাগের চিঠিপত্র মনি অর্ডার প্রাপ্তি পর্যন্ত একই তথ্য প্রযোজ্য। আমরা কোথাও সময়ের কাজ সময়ে করি না— পয়সা নিয়েও সার্ভিস দিই না— একে ইমার্জেনসী অপরের জন্য জরুরী নয়।

একজনের ভুল অনেকের জন্য বিপদ ডেকে আনে। একজনের উদাসীনতা সহস্র প্রাণে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে একমাত্র নিজেকে দুর্ভোগ পোহাতে হলেই এই সহজ সত্যটুকু আমাদের চোখে পড়ে। একটু ক্ষতিয়ে দেখলে ধরা পড়বে এমনিতে আমাদের উদ্দেশ্য মন্দ নয়, আমরা কেউই কারুরও লোকসান চাই না। অকল্যাণ কামনা করি না।

তবু ক্ষতি করি। না বুঝেই করি। আমার দায়িত্ব আমি পরিপূর্ণভাবে পালন না করলে যে সমষ্টির ক্ষতি— সেই সুবাদেই করি। অনেক সময় আমাদের মনে হয়,' আজকের' কাজ কাল হবে, এত তাড়া কি, কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। কালক্ষেপণও যে ক্ষেত্র বিশেষ মারাত্মক, তা উপলব্ধিতে অপরাগ হই।

ভুল মানুষই করে। বিভ্রান্তি মানবধর্ম কিন্তু সব বিভ্রান্তিসহনীয় নয় সমীচীন নয়। এ সংশোধন প্রয়োজন।

—হোসনে আরা শাহেদ